8-11-41

কে, বি, পিক্‌চার্সের

নটী

নিবেদন

ছায়াছবিকে আমি ভালোবেসেছি ছেলেবেলা থেকে। বহুদিন ধরে' আমার মনে বাসনা ছিল যে একদিন আমি সিনেমা ছবি তৈরি করবো। চিত্র-ভারতীর আশীর্ব্বাদে আজ আমার সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

আমার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি, বাঙলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী এবং সিনেমার একান্ত অনুরাগী সাধক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আমি ছায়াচিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম বরণ করেছি।

নন্দিনীর প্রযোজনা-ব্যাপারে এই শিল্প-ব্যবসায়ের বহু কর্ণধারের সংস্পর্শে এসে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

প্রযোজনার ক্ষেত্রে যেমন আমি নূতন ব্রতী, তেমনি অজস্র সাফল্যমণ্ডিত হিন্দী চিত্রের বিখ্যাত পরিবেষক, মান্‌সাটা ফিল্‌ম্ ডিস্‌ট্রিবিউটার্স, প্রথম এই নন্দিনী ছবি নিয়েই তাঁদের বাংলা ছবির পরিবেষণার পথে অগ্রসর হয়েছেন। কলিকাতা মহা-নগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং আমার বিশেষ প্রিয় 'সিনেমা-হাউস' রূপবাণীতে আমরা নন্দিনীর প্রথম মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছি সেজন্যে আমি আনন্দিত।

নন্দিনী ছবি যে-ষ্টুডিয়োতে প্রস্তুত হয়েছে, সেখান থেকে প্রচুর জনপ্রিয় চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ষ্টুডিয়োর সর্ব্বাধ্যক্ষ আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সর্ব্বশেষ, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, এই নন্দিনীর প্রযোজনা ব্যাপারে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যামোহন মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা আমাকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত করেছে।

তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই।

সহৃদয় দর্শকসাধারণ, হিতৈষী বন্ধুবান্ধব এবং সহযোগীদের অনুগ্রহ ও প্রীতিলাভে বঞ্চিত না হ'লে আমার সিনেমা-শিল্প-সেবার ভবিষ্যৎ কল্পনা আরও সার্থক হয়ে উঠবে।

নমস্কার!

নিবেদক

কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কে. বি. পিকচার্সের

প্রথম চিত্রার্ঘ্য

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিবেদন

নাস্তিক

গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ
শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেষক

মান্‌সাটা ফিল্‌ম্‌ ডিস্‌ট্রিবিউটার্স

সংগঠনকারীগণ

গীতকার	... ...	নজরুল ইসলাম সুবল মুখোপাধ্যায় প্রণব রায়
সঙ্গীত-পরিচালক	... ...	হিমাংশু দত্ত, সুরসাগর
আলোকচিত্রশিল্পী	... ...	বিভূতি দাস
শব্দযন্ত্রী	... ...	মান্না লাডিয়া
সম্পাদক	... ...	সুকুমার মুখার্জ্জি সুধীন্দ্র পাল
রসায়নাগারিক	... ...	জগৎ রায়চৌধুরী পূর্ণ চ্যাটার্জ্জি
ব্যবস্থাপক	... ...	লালমোহন রায়
প্রধান যন্ত্রী	... ...	চার্লস্ ক্রীড্
সর্ব্বাধ্যক্ষ	... ...	কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়

সহকারীগণ

পরিচালনায়	... ...	দিলীপকুমার মুখার্জ্জি
আলোকচিত্রশিল্পে	... ...	শচীন দাসগুপ্ত দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দধারণে	... ...	সুনীলকুমার ঘোষ কালী ঘোষ
সঙ্গীত-পরিচালনায়	... ...	কালীপদ সেন সতীশ সরকার
সম্পাদনায়	... ...	শিব ভট্টাচার্য্য
রসায়নাগারে	... ...	অশোক, প্রফুল্ল, যুগল

কারুশিল্প	রূপসজ্জা	স্থিরচিত্রশিল্প
ধীরেন মোদক	কালিদাস দাস	দীনেশ দাস
মতিলাল	ত্রিলোচন পাল	

নৃত্যশিক্ষক
সমর ঘোষ

চরিত্র-পরিচিতি

কেদারনাথ	...	... অহীন্দ্র চৌধুরী
রসিকলাল	...	... যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
যোগীন	...	... জহর গাঙ্গুলী
রবীন	....	.... ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
নন্দ মোক্তার	...	... ইন্দু মুখোপাধ্যায়
ফণিভূষণ সাঁতরা	...	... ফণী রায়

অন্যান্য চরিত্রে

তুলসী বন্দ্যো, বিপিন গুপ্ত, পশুপতি কুণ্ডু, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, (এঃ) সত্য মুখোপাধ্যায়, দীপালি গোস্বামী, প্রভাত, চিত্রগুপ্ত, কেনারাম বোকেন, অরুণ, রণজিৎ, সতীনাথ, ন্যাংটেশ্বর, বলাই, মাণিক, পাঁচুবাবু, সুশীল, বটম প্রভৃতি

শঙ্করী	...	... { শ্রীমতী রাধারাণী(ছোট) শ্রীমতী মলিনা
গৌরী	...	.... সন্ধ্যারাণী
ভবানী	...	... সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
কামিনী	...	... মনোরমা
জগমোহিনী	...	... প্রভা

নমিতা, বিজলী, নীলিমা ব্যানার্জ্জি, ঝর্ণা দে, নন্দিনী, উমা, আশা, বেলা, স্নেহ, রমা, বীণা, রেণু, গৌরী, গীতা, পান্না প্রভৃতি

কাহিনী

দুরন্ত মেয়ে শঙ্করী। বাপের অত্যন্ত আদরের একমাত্র কন্যা। বাপ কেদারনাথ চৌধুরী বাংলাদেশের স্নিগ্ধশ্যাম ছায়া-শীতল একটি পল্লীগ্রামের বড় জমিদার। শঙ্করীকে খুব ছোট রেখে শঙ্করীর মা মারা যাবার পর কেদারবাবু যে-মেয়েটিকে আবার বিবাহ করে' আনলেন, তাঁর নাম ভবানী। এই ভবানী দেবীর নামে কেদারবাবু তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ীর নাম রেখেছেন—ভবানী-ভবন। ভবানী এসে মা-হারা শঙ্করীকে ঠিক নিজের মায়ের মতই কখনো আদরে, কখনো-বা শাসনে মানুষ করে' তুলতে লাগলেন। ছেলেবেলা থেকেই কিন্তু বাপের অত্যন্ত আদরে শঙ্করী বড় চঞ্চল, বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছিল।

ছবি যখন আরম্ভ হলো তখন দেখা গেল, শঙ্করীর এমনি এক দুরন্তপনায় ভবানী ভয়ানক উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

কেদারবাবু বলেন—ছেলেমানুষ, কেউ ওকে বুঝবে না

ভবানী, ওর মন কেউ জানতে চাইবে না, ওর দুরন্তপনাটাই শুধু দেখবে। আরও কিছুদিন আমাদের কাছে থাক্। আর একটু বড় হোক্। তারপর বিয়ে দেবো, পরের বাড়ী চলে' যাবে।

শঙ্করী বড় হ'লো। কিন্তু দুরন্তপনা কমলো না।

ঘটক যতবার সম্বন্ধ নিয়ে আসে, শঙ্করী প্রতিবারই এমন এক-একটা কাণ্ড করে' বসে, যে তা'রা বিরক্ত, অপমানিত হয়ে চলে' যায়।

শেষে একদিন কেদারবাবু অত্যন্ত রেগে গিয়ে বল্লেন, এমন একটি পাত্র দেখো, বড়লোক না হলেও চলবে, আমার কাছেই থাকবে—জমিদারির কাজকর্ম্ম দেখবে।

বিয়ে হ'লে শঙ্করী পরের বাড়ী চলে' যাবে—দুরন্তপনার জন্যে কত গঞ্জনা পাবে, কেদারবাবুর তা' সহ্য হবে না। তা' ছাড়া শঙ্করীকে চোখের আড়াল করলে তাঁর যে কষ্ট হবে!

ঘটক একটি পাত্রের সন্ধান নিয়ে এলো। পাত্রের ঠাকুরদা রসিকলাল মাঝারি গৃহস্থ, উপযুক্ত পুত্র এবং জামাইয়ের শোকে ভদ্রলোক হাসতে ভুলে গেছেন। নিরানন্দময় তাঁর সংসার। সংসারে তাঁর একটি বিধবা মেয়ে কামিনী, আর তাঁর আদরের নাতি যোগীন।

যোগীন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। অত্যন্ত খামখেয়ালী, একজেদী, সরল এবং গানবাজনা-পাগল। দিনরাত সে বেহালা বাজায়, সখের যাত্রায় কখনো কখনো পার্টও করে, গানও গায়। ছেলেটির বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। কঠোর মুখশ্রীর আড়ালে একটি মধুর কমনীয়তা আত্মগোপন করে'

আছে। স্থানকালপাত্র বিচার-বিবেচনা নেই, অপ্রিয় সত্য বলতে তার মুখে বাধে না। আসলে সে জন্মগত শিল্পী এবং তথাকথিত সভ্যতার চাপে মোটেই আড়ষ্ট নয়।

কেদারবাবুর মনের অবস্থা ভালো থাকলে কি হতো বলা যায় না, কিন্তু নিয়তির নির্দ্দেশে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কে জানে—যোগীনের সঙ্গেই শঙ্করীর বিয়ে হয়ে গেল।

রসিকলালের সংসারে লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিয়েছে। নাতি-নাত-বৌ নিয়ে শোক-গ্রস্ত রসিকলালের রসিকতার মরা নদীতে আবার জোয়ার এসেছে। কিন্তু বাপের যা-কিছু সামান্য সম্পত্তি আছে তার দিকে ঈর্ষা-কুটিল চক্ষে চেয়ে থাকে কামিনী। ভাইপো যোগীন আর ভাইপো-বৌ শঙ্করীকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

দিনরাত শঙ্করীর পেছনে সে লেগেই থাকে। শঙ্করীর নামে নালিশ করে রসিকলালের কাছে, রসিকলাল গ্রাহ্যই করেন না।

শঙ্করীও ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়। সেও কামিনীকে উচিতমতো জবাব দিতে ছাড়ে না।

ওদিকে যোগীন আর শঙ্করীর ভাবও যেমন, ঝগড়াও তেমনি। এ রকম অদ্ভুত মারাত্মক ভালোবাসা বড়-একটা দেখা যায় না। তাদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া দেখে মনে হয় এই বুঝি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড বাধলো বলে', কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় দুজনের বেশ মিল হয়ে গেছে। তুচ্ছ কারণে ঝগড়া বাধেও যেমন, আবার মিটেও যায় তেমনি অতি সহজেই।

বাইরে থেকে দেখলে অন্য লোকের হয়ত-বা মনে হতে পারে শঙ্করীর বড় কষ্ট, কিন্তু আশ্চর্য্য, শঙ্করী সত্যিই সুখে আছে।

নাতবৌ-এর সুখের জন্যে রসিকলাল তাকে বার-বার তাগিদ দেন—তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখে হাজার-খানেক টাকা চাও দিদি—তোমাকে ত' আমি সুখে রাখতে পাচ্ছি না— তা ছাড়া কবে আছি কবে নেই, যোগীন যে-রকম বাউণ্ডুলে ও ত' কিছু করবেও না, কিছু রাখতে পারবে বলেও মনে হয় না।

শঙ্করী তার বাপের কাছে স্বামীর সংসারকে ছোট করতে চায় না—সে বলে : আমি বেশ আছি দাদু, আমার জন্যে ভেবো না। টাকার কথা বাবাকে লিখতে আমার লজ্জা করে।

এদিকে শঙ্করীর বিমাতা ভবানীর বাপের বাড়ী থেকে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির, তার ভাইয়ের কলেরা হয়েছে।

ভবানী সেখানে গেলেন। ভাই মারা গেল, তার পরদিন ভ্রাতৃবধূও মারা গেল একটি পাঁচ-ছ' বছরের শিশুসন্তান রেখে।

ভবানী তার সেই সদ্য বাপ-মা-হারা ভাইপোটিকে নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর স্বামীর কাছে। এমন দিনে যোগীন আর শঙ্করী এলো বাপের বাড়ীতে।

শঙ্করী দেখলে বিমাতার কোলে একটি ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে। শঙ্করী জিজ্ঞাসা করলে,—এ কে মা?

ভবানী জবাব দিলেন,—ওপরে চল্—বলছি!

যোগীন বল্‌লে—ভালো আছেন, মা? বলবার সে এক চমৎকার ভঙ্গি! তারপরই হঠাৎ বলে' বসলো : বাঃ দিব্যি ছেলেটি ত! কার? আপনার?

লজ্জায় ভবানী কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

স্বামীকে নিয়ে শঙ্করী আর পারে না! ওকে সামলাতে সামলাতেই শঙ্করী অস্থির হয়ে গেল। না জানি বাবা-মা কি মনে করবেন, হয়ত ভুল বুঝবেন ওকে।

শঙ্করী তার স্বামীকে কিন্তু বেশিদিন আড়াল করে' রাখতে পারলে না। একদিন এক ঝুমুরের আসরে কেদারবাবু দেখলেন—জামাইটি তাঁর হ্যা হ্যা করছে আর মাথা নাড়ছে। ভবানীও দেখলেন।

কেদারবাবু বল্‌লেন—মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি। জামাইটে হাড়-বজ্জাটে, বাউণ্ডুলে।

শঙ্করী সব শুনলে। শুনে একটু গুম হয়ে গেল। ঝিকে দিয়ে স্বামীকে আসর থেকে ডেকে আনতে পাঠালে। যোগীন উঠে আসতেই শঙ্করী তাকে নানা রকম করে' বোঝাতে লাগলো।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। যোগীন উঠলো চটে। বল্‌লে, হুত্তোর শ্বশুরবাড়ী! আমি চল্লম।

শঙ্করী কেঁদে ফেল্‌লে। যোগীনের পায়ের কাছে হেঁট হয়ে প্রণাম করে' বললে, আবার এসো। চিঠি লিখো কিন্তু।

যোগীনের মন নরম হ'লো। বেহালার বাক্স নিয়ে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে গেল।

যোগীন কলকাতায় গিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে করতে এক যাত্রারদলে চাকরি নিলে। তাদের হিরো তখন পালিয়েছে। তিরিশ টাকা মাইনে ঠিক হ'লো। যোগীন হিরোর পার্ট করতে লাগলো।

কেদারবাবু রাধানগরে গেছেন। সেখানে এক যাত্রার আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে লজ্জায় ফিরে এলেন, দেখলেন—রাম সেজেছে তাঁরই একমাত্র জামাতা—যোগীন

এদিকে শঙ্করী তখন সন্তানসম্ভবা।

যোগীন দুদিনের ছুটি নিয়ে মহা আনন্দে শ্বশুরবাড়ী এলো চাকরী পেয়েছে এই কথা শঙ্করীকে জানাবার জন্যে।

এর আগে শঙ্করী শুনেছে তার বাপ কি রকম রেগেছেন যোগীনের ওপর।

এইবার শ্বশুরের সঙ্গে যাগীনের বাধলো ঝগড়া। কথায় কথায় কেদারবাবু নিজের রাগ কিছুতেই সামলাতে পারলেন না। যোগীনকে বললেন, তুমি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। আমি জানবো, আমার মেয়ে বিধবা। রাগ করে' যোগীন চলে' গেল।

হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে দেখলে দুদিন পরে তাদের যেখানে যাত্রা হবার কথা ছিল সেখানে যাত্রা হয়নি, সাজের বাক্স প্রভৃতি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করা হয়েছে। তাদের অধিকারী হায় হায় করছেন, দলের একজন হঠাৎ কলেরায় মারা গেছে।

এই 'মারা গেছে' কথাটা কি রকমভাবে যোগীনের মাথায় লেগে গেল।

সে নিজেই অন্যের নাম দিয়ে এক চিঠি লিখে বসলো নিজের মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে। সেই চিঠি এসে হাজির হ'লো রসিকলালের বাড়ীতে।

সেই চিঠি গেল কেদারবাবুর বাড়ীতে।

কেদারবাবু স্তব্ধ হয়ে বসে' রইলেন, যোগীনকে যা' বলেছিলেন তিনি রাগের মাথায়, তাই হ'লো। যোগীন নেই! শঙ্করী,—শঙ্করীর মুখের দিকে তিনি তাকাবেন কেমন করে'?

শঙ্করী সেই চিঠি হাতে করে' গিয়ে ছুটলো তার ঘরে—যাবার দিন পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে যোগীন লিখে রেখে গেছলো, সে আর আসবে না। পরের দিন শঙ্করী লজ্জায় তা মুছে ফেলেছিল। চিঠির লেখার সঙ্গে সেই লেখা সে মেলাতে লাগলো।

শঙ্করী কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করলে না—কিছুতেই শাঁখা-সিঁদুর খুললে না—কিছুতেই না।

শঙ্করীর রাত্রে ঘুম হয় না। মনে হয়, কে যেন আসবে—এসে ফিরে যাবে।

একদিন তন্দ্রার ঘোরে শঙ্করী যেন শুনতে পেলে অত্যন্ত মৃদু অথচ পরিচিত কণ্ঠস্বর, শঙ্করী!

শঙ্করী ধীরে ধীরে উঠলো। সিঁড়ি দিয়ে যেতে যেতে তার পা লেগে হঠাৎ কি যেন একটা পড়ে' গেল।

ভবানী উঠে বসলেন। তিনিও শঙ্করীর পিছু নিয়েছেন।

ভবানী ডাকলেন, শঙ্করী! হঠাৎ একটা ছায়ামূর্ত্তির মতো একটা লোক যেন ভবানী আর শঙ্করীর চোখের সুমুখ থেকে চলে' গেল।

চোর! চোর! একটা গোলমাল উঠলো।

ভবানী শঙ্করীকে ধরে' ফেললেন। বললেন, ও মা, তাই তুই শাঁখা-সিঁদুর ফেলিসনি।

কেদারবাবু শুনলেন, শঙ্করী কলঙ্কিনী!

অসহ্য মর্ম্মযন্ত্রণায় তিনি বলে' উঠলেন, আজ থেকে আমি জানবো আমার মেয়ে মরেছে।

শঙ্করী ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে আত্মহারা হয়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়লো।

রসিকলালের বাড়ী ছুটতে ছুটতে গিয়ে যখন সে পৌছুলো তখন ভোর হয়েছে।

কামিনী অকথ্য অপমান করে' তাকে তাড়িয়ে দিলে।

শঙ্করী বেরিয়ে গেল।

কেদারবাবু মেয়েকে খুঁজতে বেরুলেন। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ষোলো-সতেরো বছর পরে আবার যখন গল্পের যবনিকা উঠলো, দেখা

গেল—শঙ্করী এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছে। ভদ্রলোক মোক্তারি করেন, নাম নন্দলাল। অত্যন্ত সাধাসিধে মানুষ, আপনভোলা। বড় ভাল লোক। শঙ্করীর মেয়ের বয়স তখন ষোলো-সতেরো।

শঙ্করীর মেয়ে গৌরীকে তিনি বড় ভালবাসেন। মেয়ের মতো যত্ন করেন শঙ্করীকে। তাঁর স্ত্রী জগমোহিনী স্থূলাঙ্গী এবং ভোজনপটু। এই দম্পতির সবে ধন নীলমণি একটি ছেলে আছে, নাম গোবিন্দ। গোবিন্দ একটু হাবাগোবা গোছের। মায়ের অত্যন্ত আদুরে।

গৌরী ঠিক ছেলেবেলাকার শঙ্করীর মতো চঞ্চল আর দুরন্ত হয়ে উঠেছে।

জগমোহিনীর মনের গোপন বাসনা, গৌরীর মতো সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি গোবিন্দর বৌ করে' ঘরেই রাখবেন।

ইতিমধ্যে একদিন পুকুরে জল আনতে গিয়ে হঠাৎ এক অদ্ভুতভাবে একটি প্রিয়দর্শন তরুণের সঙ্গে ঝগড়ার মধ্য দিয়ে গৌরীর বেশ ভাব জমে উঠলো। ছেলেটি গ্রামের জমিদার রবীন, শিকারের সখ আছে। শিকার করতে এসে সেদিন গৌরীকে দেখে তার উন্মুখ যৌবনের প্রথম প্রেম সহসা জেগে উঠলো।

ঘটক এসেছিল তার বৃদ্ধ নায়েব বিশুবাবুর কাছে।

রবীন কি ভেবে, ঘটককে ডেকে গোপনে সেই গৌরীর সঙ্গেই সম্বন্ধ ঠিক করতে বল্‌লে। বারণ করে' দিলে, যেন কোনোরকমেই তার নাম না প্রকাশ করে' ফেলে।

নন্দ মোক্তার মহা খুসী। জগমোহিনীর মনে কিন্তু আনন্দ নাই।

গোপনে পুকুরপাড়ের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় দেখা-শোনা চল্‌তে থাকে রবীন আর গৌরীর।

শঙ্করী বারণ করে।—যাসনি গৌরী, যখন-তখন এমন করে' বাইরে যাস নি, জমিদারের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হচ্ছে।

নন্দলাল একদিন বন্দুকের আওয়াজ শুনেই এসে ধমকে দিলেন রবীনকে। বন্দুকের আওয়াজ শুনলে নাকি তাঁর বুক ধড়ফড় করে।

এই বিয়ে নিয়ে কিন্তু জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলো। বিশুবাবু ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং ডেকে পাঠালেন রবীনের পিসেমশাই এবং অভিভাবক কেদারবাবুকে।

কেদারবাবু এসে যখন শুনলেন যে রবীন এক মোক্তারের বাড়ীর রাঁধুনীর মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তখন তিনি বল্‌লেন যে বিয়ের ব্যাপারে তিনি কক্ষনো থাকবেন না।

কিন্তু নন্দ মোক্তার ছাড়বার পাত্র নন, তিনি এসে জোর করে কেদারবাবুকে নিয়ে গেলেন তাঁর নাতনি গৌরীকে দেখাতে।

কিন্তু এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা যে তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার পূর্ব্বে

গোবিন্দর মারফৎ জানা গেল, গৌরী পুকুরপাড়ে সেই নিভৃত স্থানটিতে আছে।

কেদারবাবু পেছন দিক থেকে দেখে মর্ম্মাহত হলেন, দেখলেন, মোক্তারবাবুর নাতনিটির পাশে একটি ছোকরা বসে' আছে। ছোকরাটি অর্থাৎ রবীন পালিয়ে গেল। গৌরী অপ্রস্তুত হয়ে 'দাদু' বলে' ডেকে সামনে ছুটে আসতেই দেখতে পেলো, না তার দাদু ত' নয়, অপরিচিত কে এক বৃদ্ধ।

কেদারবাবু বাড়ী ফিরে গিয়ে জোর করে' রবীনকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে চলে' গেলেন।

নন্দলাল আবার গৌরীর জন্য সম্বন্ধ খুঁজছেন। এবার আর জমিদার নয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।

ঝুলনের দিনে তা'রা গৌরীকে দেখতে এসেছে।

গৌরী পুকুরঘাটে গেছে। অত্যন্ত বিমর্ষ তার মনের ভাব।

ঝুলনের মেলায় রবীন একজন বড় পাণ্ডা। সে ছুটে এসেছে তার পিসিমার কাছ থেকে। এসে প্রথমেই পুকুর পাড় থেকে গৌরীকে তুলে নিয়ে একেবারে মেলায়।

সেখানে যাত্রা হচ্ছিল। কে একটি লোক বেহালা বাজাচ্ছে। বড় চমৎকার হাত। গৌরী যেন কিসের আকর্ষণে সেখানে এগিয়ে গেল। লোকটিও হঠাৎ গৌরীর দিকে একবার তাকিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

রবীন যখন চুপি চুপি গৌরীকে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিলে তখন রাত অনেক হয়েছে।

জগমোহিনী দেখলেন, ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। তিনি ভোর বেলায় শঙ্করীকে আর গৌরীকে গরুর গাড়ীতে চড়িয়ে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। ইচ্ছে, সেখানে গিয়ে গোবিন্দর সঙ্গে বিয়ে দিবেন। এখানে থাকলে সেই 'বন্দুক-ছোঁড়া' এসে আবার না জানি কি কাণ্ড বাধায়।

রবীনের মন ভাল ছিল না। সকাল বেলায় এসে খবর নিতে গিয়ে গোবিন্দর সঙ্গে দেখা। গোবিন্দর মুখে হাসি আর ধরে না। সে বল্‌লে, চালাও, চালাও বন্দুক! সে চলে' গেছে—আমার মামার বাড়ী। হুঁ, হুঁ,—হজরতপুর—কিছুতেই বলবো না।

রবীন সজোরে ষ্টেশনের দিকে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

অনেক চেষ্টার পর শঙ্করী আর গৌরীকে রবীন বাড়ী নিয়ে এলো। বিশুবাবু দারুণ বাধা দিলেন। শেষে রেগে বল্‌লেন, দাঁড়াও তোমার পিসিমা-পিসেমশাইকে খবর দিচ্ছি।

শঙ্করীর ঘুম আসে না।

মেলায় দূরে যাত্রা হচ্ছে। নল-দময়ন্তীর পালা। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্যে দময়ন্তীর কান্না গানের সুরে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। আর বেহালায় কেমন যেন একটি জন্মান্তর-স্মৃতির মতো অতি পরিচিত রাগিণী এসে সজোরে তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত করছে।

শঙ্করী আবিষ্টের মতো উঠে বসলো।

যাত্রা থেমে গেছে। গভীর নিশুতি রাত। শঙ্করী ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আধ-আলো-অন্ধকারে এগিয়ে চললো, যাত্রার সাজঘরের দিকে। শঙ্করীকে আচমকা দেখেই অধিকারী 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করে' উঠলেন।

শঙ্করী ধীরে ধীরে এসে জমিদার বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালো।

তারপর বাকী রাতটুকু কেমন করে' যে শঙ্করীকে চুপ করে' সেই উন্মত্ত জনতার মাঝখানে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তা শুধু সেই জানে।

তার চোখের সুমুখে তখন একসঙ্গে সব আলো নিবে গেছে।

ভোরবেলা হঠাৎ ভিড় ঠেলে সদ্য ঘুম ভেঙে চোর দেখতে যোগীন এলো। এসেই শঙ্করীকে দেখে চীৎকার করে' উঠলো, শঙ্করী!—

—শঙ্করীর ঠোঁট দুটি তখন থরথর করে' কাঁপছে।

রবীন জিজ্ঞাসা করলে গৌরীকে—কে?

গৌরী মাথা নেড়ে বললে, জানি না।

শঙ্করী ডাকলে—গৌরী আয়।

শঙ্করী, গৌরী আর যোগীন পথে নেমেছে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই প্রান্তর পায়ে হেঁটে তা'রা তাদের নিরুদ্দেশের পথে এগিয়ে চললো।

কেদারবাবু আর ভবানী তাদের পাশ দিয়েই এসে নামলেন রবীনের বাড়ীতে।

বিশুবাবু খানিকক্ষণ কুশলপ্রশ্নাদির পর কেন যে তাঁকে আনিয়েছেন, বললেন। বললেন, সেই রাঁধুনী বামনীর কাল রাত্রের সমস্ত ইতিহাস।

কেদারবাবু থম্‌কে থম্‌কে উঠছেন, একএকবার অন্যমনস্ক হচ্ছেন, আর ভাবছেন, না, না এওকি সম্ভব!

কিন্তু অবশেষে যখন তিনি শুনলেন, মেয়েটির নাম শুভঙ্করী না কি যেন একটা ঐ রকম, তখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়লো।

দীর্ঘকাল কন্যা-বিরহ-কাতর জরাজীর্ণ শীর্ণ ভগ্নপ্রাণ স্নেহপ্রবণ নিরবলম্ব বৃদ্ধ পিতা উন্মাদের মতো পথে নেমে ছুটতে সুরু করলেন তাঁর হারানো মেয়ে শঙ্করীর সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় শঙ্করী?

শঙ্করী কি তার বাপের কোলে ফিরে এলো?

গান

১

আবহ-সঙ্গীত :

(ও আমার) গাঁয়ের মাটি, লক্ষ্মী মাগো
আমার প্রণাম লও !
ব্যথায় ভরা জীবনে মোর
সুখের কথা কও ।
সবুজবরণ ধানের ক্ষেতে,
রামধনু রঙ আঁচল পেতে
নতুন ধানের মঞ্জরী গো,
(আমার) আশায় জেগে রও !
(আমার) ভাষায় জেগে রও ।

—সুবল মুখোপাধ্যায়

২

যশোদা : নীলিমা ব্যানার্জ্জি

তোরা মারিস নে গো, মারিসনে মোর
নীলমণিরে,
আমার, মাথার কিরে ।
ও সে দুরন্ত মোর ননীচোরা,
চিরদিন ত' জানিস তোরা—
তোদের যত ক্ষতি করেছে শ্যাম, মূল্য দিয়ে
দিব ফিরে,
হাতে ধরি ও কিশোরী কাঁদাসনে আর
জননীরে ॥

—সুবল মুখোপাধ্যায়

৩

নমিতা : শঙ্করীর বন্ধু

বঁধু, মিলন-বাসর-রাতে,
বধূর মধুর মুখপানে চাও, আঁখি মিলাও
আঁখিপাতে ।
উজল চাঁদের হাসিধারা,
চামেলি বনে হ'লো পথহারা—
অনুরাগে তারে বাঁধো বাহুপাশে,
হিয়া বাঁধো হিয়া সাথে ॥
দেখো কুহুরবে জাগে নিশা,
মদির পবনে মধু মিশা—
কুসুমশয়নে মাধবী যামিনী জাগাও
সুরের ইসারাতে ।

— সুবল মুখোপাধ্যায়

৪

যোগীন :

বিধুমুখে মৃদু হেসে আমার পানে চাও,
ও রূপসী পূর্ণশশী চকোরে বাঁচাও ।
কেমন করে' জংলা পাখী,
মনের খাঁচায় বেঁধে রাখি—
সেই কথাটি কানে-কানে আমায়
বলে' দাও

—সুবল মুখোপাধ্যায়

৫

রাধা : কর্ণা দে

শোনো শোনো নন্দপুর নাগরিকা,
অঙ্গে আমার শ্যাম-কলঙ্ক-লিখা ॥
নিবিড় নীল মেঘে,
নব অনুরাগ বেগে
জলিয়া উঠেছি গো।
বিজলী-লতিকা ॥

—সুবল মুখোপাধ্যায়

৬

গৌরী :

কি যে মোর মনের কথা
(আমি) বলবো না তোমারে,
(তুমি) আপনি চিনে নাও গো
তোমার প্রিয়তমারে ॥
তুমি যে রাতের তারা—
আমি নীল জলধারা,
তোমার এ ছায়ায় মায়া, হিয়া মোর বইতে
নারে ॥
হে রাতের সুদূর স্বপন—
কত আর রবে গোপন ?
চিনে নাও আপন জনে, চিনে নাও
আপনারে ।

—সুবল মুখোপাধ্যায়

৭

ঝুমুর :

চৈতীরাতের চাঁদ,
মহুয়াবনের চাঁদ,
আকাশে উঠেছে, সইলো
শালবনে বাজলো মাদল ।।
চাঁপা ফুল তুলে, পরবো এলো চুলে
পলাশের হার নিয়ে, পরব বাহার দিয়ে
আঁকবো নয়নে কাজল ॥
শাল বনের পথে,
চাঁদের আলোতে,
বাজায় বাঁশী
ও কে মন-উদাসী
শুনে পায়ের নূপুর, বাজে ঝুমুর ঝুমুর,
মনের ময়ূর যে মোর হ'লো চপল ॥

—প্রণব রায়

৮

গৌরী :

বনফুল ! বনফুল সই !
(আয়) মনের কথা তোরে কই ।
(আজ) বঁধুর সনে, (হবে) দেখা বিজনে,
(মোর) মনের বনে তাই, আজ বাজে বাঁশরী ।
ওলো বনলতা অমন করে',
তুই টানিস্‌নে মোর আঁচল ধরে' ।
ওই দীঘির কাছে,
বঁধু দাড়িয়ে আছে,
আমায় দিস্‌নে বাধা তোরে বারণ করি ।
জল নিতে ঢেউ ওঠে নীল যমুনায়,
আঁখি দু'টি ফিরে ফিরে পিয়াপথ চায় ।
বুঝি এই বাঁকা পথ
সেই গোপন শপথ,
অকরুণ বঁধু আজ ভুলে গেছে হায়,
আঁখি দু'টি তবু পিয়া-পথ চায় ॥

—প্রণব রায়

৯

আবহ-সঙ্গীত :

চোখ গেল, চোখ গেল, কেন ডাকিসরে—
চোখ গেল পাখী ?
তোর ও চোখে কারও চোখ পড়েছে
নাকি রে—চোখ গেল পাখী !
চোখের বালির জ্বালা জানে সবাই রে
জানে সবাই,
চোখে যার চোখ পড়ে তার ঔষধ নাই রে
ঔষধ নাই ।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় তাদের আঁখিরে—
চোখে গেল পাখী !
তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশিরাতে
বুকে লাগে,
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা বলে' তাই ডাকিস
অনুরাগে রে ।।
ওরে বন-পাপিয়া, কাহার গোপন পিয়া
ছিলি আর জনমে,
আজও ভুলতে নারিস, আজও ঝুরে হিয়া,
ওরে পাপিয়া, বল যে হারায়,
তাহারে কি পাওয়া যায় ডাকি রে
চোখ গেল পাখী ।।

—নজরুল ইসলাম